সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

সংগঠিত ডিজিটাল ব্ল্যাকমেইলিং
প্রতিরোধে সমন্বয় জরুরি

একসময় ডিজিটাল অপরাধ বা ব্ল্যাকমেইলিং ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা; কিন্তু বর্তমানে কিছু সংগঠিত দল কাজটি করছে। এরা পেশাদার ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এ নেটওয়ার্ক হানা দিয়েছে রাজনীতির মাঠেও।

এতে জানানো হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও বা তথ্য সংগ্রহ করছে চক্রগুলো। এসব তথ্য দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হচ্ছে সাধারণদের। দাবি করা হচ্ছে অর্থ। ব্ল্যাকমেইলের শিকার হচ্ছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পরিবার এবং শীর্ষ নেতাদের নাম-পরিচয় ব্যবহার করেও বানানো হচ্ছে ভুয়া ফটোকার্ড। ছড়ানো হচ্ছে বিকৃত ভিডিও, মিথ্যা তথ্য। মানুষের গোপনীয়তাকে বানিয়ে তোলা হচ্ছে পণ্য। এগুলো কেবল অপরাধ নয়, আমাদের জাতীয় উদ্বেগেরও কারণ।

“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে বানানো হচ্ছে ‘ডিপফেক’ ভিডিও। করা হচ্ছে ভয়েস ক্লোন। রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি এবং জনমত বিভ্রান্ত করতেও ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিাপ্রতিষ্ঠানে এসব ডিজিটাল কারসাজি করে সাইকোলজিক্যাল অপারেশন চালানো হচ্ছে। এগুলো তরুণ প্রজন্মের বিকাশে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে। ভুক্তভোগীরা সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে মুখ খোলেন না। এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে অপরাধী চক্র।”

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে বানানো হচ্ছে ‘ডিপফেক’ ভিডিও। করা হচ্ছে ভয়েস ক্লোন। রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি এবং জনমত বিভ্রান্ত করতেও ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিাপ্রতিষ্ঠানে এসব ডিজিটাল কারসাজি করে সাইকোলজিক্যাল অপারেশন চালানো হচ্ছে। এগুলো তরুণ প্রজন্মের বিকাশে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে।

ভুক্তভোগীরা সাধারণত লোকলজ্জার ভয়ে মুখ খোলেন না। এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে অপরাধী চক্র। এ সঙ্কট মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এর জন্য কেবল আইন যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বিত পদপে নিতে হবে। ‘সাইবার সুরা আইন, ২০২৬’-এর কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগতভাবে আরো দ ও সংপ্তি করা জরুরি, যাতে অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনা যায়। এতে ভুক্তভোগীদের মনে ভরসা তৈরি হবে।

ধীরে ধীরে দেশের প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে শিাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ‘ডিজিটাল লিটারেসি’ বাধ্যতামূলক করার দিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এতে তরুণদের জন্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সহজ হবে। সেই সাথে ডিজিটাল কারসাজির বিষয়েও সচেতন হতে পারবে তারা। প্রতিটি থানায় আলাদা সাইবার ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এতে ভুক্তভোগী নারীদের জন্য বিশেষ গোপনীয়তা রা করে অভিযোগ নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রাজনীতির মাঠে ডিজিটাল প্রোপাগান্ডা ঠেকাতে উদ্যোগী হতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে। নিজ নিজ দলের কর্মীদের ডিজিটাল আচরণে দায়বদ্ধ করতে হবে। মোট কথা গুজব বা বিকৃত তথ্য প্রচার করে ফায়দা হাসিলের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তথ্য যেমন শক্তি, অপতথ্য তেমনি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র; তাই সরকারের প থেকে শক্তিশালী সাইবার নজরদারি এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে প্রচার চালাতে হবে। ব্যক্তি সচেতনতা, সামাজিক প্রতিরোধ ও আইনের শাসন- এই তিনের সমন্বয়ে ডিজিটাল ব্ল্যাকমেইলের গোড়া উপড়ে ফেলা সম্ভব। না হয় এই আধুনিক মারণাস্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় নিরাপত্তাকে স্থায়ীভাবে হুমকিতে ঠেলে দেবে।

পশুশক্তির আস্ফালন নয়

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার দাওকান্দি সরকারি কলেজে বিএনপির নেতাদের মারধরের শিকার হয়েছেন অধ্য ও একজন নারী প্রদর্শক। এ-সংক্রান্ত ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত না হলে বোঝা যেত না, কি রকম নিন্দনীয় কাজ করেছেন এই বিএনপি নেতারা। অভিযোগ করা হয়েছে, বিএনপির এই নেতারা কলেজে এসেছিলেন চাঁদা চাইতে।

এলাকার চাঁদাবাজ চক্রকে খুশি করেই কলেজ চালাতেন আগের দুই অধ্য। বলা হচ্ছে, নতুন অধ্য চাঁদা দেওয়া বন্ধ করায় চাঁদাবাজ চক্র গোসসা করে। তারই জের ধরে শিকের গায়ে হাত। শিকের গায়ে হাত যাঁরা দিয়েছেন এবং যাঁরা সে সময় ঘটনাস্থল বা আশপাশে ছিলেন, তাঁদের নামগুলোও প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এদের প্রায় সবাই বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মী। তাৎণিকভাবে একজন নেতাকে বিএনপি বহিষ্কারও করেছে।

ঘটনার বিশদ আলোচনায় আমরা এখানে যাব না। শুধু একটি প্রশ্ন তুলতে চাই: বহিষ্কৃত একজনই কি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন? বাকি যে নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা সে সময় কোন ভূমিকা পালন করেছেন? তা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে? তাঁদের ব্যাপারে মতাসীন দলের কোনো নির্দেশনা দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে, বিএনপি এখন শুধু যে কোনো একটি রাজনৈতিক দল নয়, তারা মতাসীন দল। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। বিতর্কিত কাউকে শুধু দলের কার্যক্রম থেকে বের করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ নেই তাদের। বহিষ্কার করলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাত খুন মাফ হয়ে যায় না। যাঁরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের কি প্রচলিত আইনে বিচার হবে না? সরকারকে নিজের ভাবমূর্তির স্বার্থে হলেও সেই নির্দেশ দিতে হবে। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। আর দল হিসেবে বলতে হয়, শুধু বহিষ্কার করেই বিএনপির দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ভবিষ্যতে যেন কেউ দলের নাম ভাঙিয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড না করতে পারে, সে লে্যও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

“শুধু একটি প্রশ্ন তুলতে চাই: বহিষ্কৃত একজনই কি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন? বাকি যে নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা সে সময় কোন ভূমিকা পালন করেছেন? তা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে? তাঁদের ব্যাপারে মতাসীন দলের কোনো নির্দেশনা দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে, বিএনপি এখন শুধু যে কোনো একটি রাজনৈতিক দল নয়, তারা মতাসীন দল। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। বিতর্কিত কাউকে শুধু দলের কার্যক্রম থেকে বের করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ নেই তাদের। বহিষ্কার করলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাত খুন মাফ হয়ে যায় না।”

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যেভাবে দেশজুড়ে শিকেরা নির্বিচারে মবের হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন, সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে পাঠকদের। এখনো কি তা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। সমাজে শিকের অবস্থান এখনো সম্মানের আসনে। তাদের অপমান করা হলে সে লজ্জা গোটা জাতির। এ কারণে বিএনপি শিক নিগ্রহের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক পদপে নেবে বলেই সবার প্রত্যাশা।

শিাঙ্গনে প্রায়ই শিার্থী কিংবা বহিরাগত ব্যক্তিরা এসে শিক-কর্মচারীদের নিগৃহীত করে চলেছেন। প্রশাসনের প থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। তাতে শিকের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি শিার পরিবেশ হবে বিঘ্নিত।

বড়দের রাজনীতি, ছোটদের মৃত্যু

তানজিনা হোসেন
চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক

হামসহ অন্যান্য জটিলতার কাছে হার মানতে হয়েছে সাদমানকে। শিশুটির মরদেহ এভাবে চাদরে ঢেকে বাড়ির পথে তার এক স্বজন। আলোচিত এই ছবি রাজধানীর মহাখালী এলাকা থেকে তোলেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক খালেদ সরকার।

হামসহ অন্যান্য জটিলতার কাছে হার মানতে হয়েছে সাদমানকে। শিশুটির মরদেহ এভাবে চাদরে ঢেকে বাড়ির পথে তার এক স্বজন। আলোচিত এই ছবি রাজধানীর মহাখালী এলাকা থেকে তোলেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক খালেদ সরকার।

২০২২ সালে বিল গেটস একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেনড়হোয়াই ডু চিলড্রেন ডাই? প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, ‘হ্যাঁ, এটা সত্য, এখনো বিশ্বে শিশুরা নানা রকম রোগবালাইয়ে মারা যায়, কিন্তু এটা একটা খণ্ডিত সত্য। আসল সত্য হলো শিশুরা যে এসব রোগে মারা যায়, তার কারণ নিহিত রয়েছে তারা কোন দেশে জন্মেছে তার ওপর!’

বাংলাদেশের হতভাগ্য শিশুরা এই নির্মম সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এই দেশে জন্মেছে বলেই এ বছর মার্চুএপ্রিলে হামের মতো একটি সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগে ঝরে গেল দুই শর কাছাকাছি শিশুর প্রাণ।

সাম্প্রতিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে মোট ১৯ হাজার ১৬১ সন্দেহভাজন হাম রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে। একই সময়ে পরীা করে নিশ্চিত রোগী পাওয়া গেছে ২ হাজার ৮৯৭টি। এ সময় হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬৬টি শিশুর। (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো)

এভাবেই কলমের এক খোঁচায় মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে যায় আমাদের শিশুদের। শিশুরা তা কখনো জানতেই পারেনি, পারবেও না। হ্যাঁ, এই শিশুদের অপরাধ যে তারা জন্মেছে এই দেশে।

অথচ এ দেশের বাবুমায়েরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন শেষ কবে হামের কারণে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছিল এভাবে। ১৯৯০ সালে বিশ্বজুড়ে শিশুমৃত্যুর চতুর্থ কারণ ছিল হামজনিত মৃত্যু, দুনিয়াতে বছরে পাঁচ লাখ শিশু মারা যেত হামজনিত জটিলতায়। কিন্তু এর পরের ৩০ বছরে এই মৃত্যু স্রেফ ৮৭ শতাংশ কমে গেল। কোন জাদুতে এই ঘটনা ঘটেছিল? এই জাদুর নাম টিকা। ২০০০ সালে গ্যাভি ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স বিশ্বজুড়ে ৫০০ মিলিয়ন শিশুকে হামের টিকা দেওয়ার এক মহাযজ্ঞ শুরু করে। রুটিন টিকা কার্যক্রমের পাশাপাশি শুরু হয় বিশেষ টিকা ক্যাম্পেইন। দেশে দেশে শুরু হয় এই যজ্ঞ, ধনী দেশগুলো এগিয়ে আসে দাতা হিসেবে, দরিদ্র ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ব্যাপক হারে টিকা প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে শুরু করে। ফলাফলড়নাটকীয়ভাবে কমে যেতে থাকে হামজনিত মৃত্যু। বিগত দুই দশকের মধ্যে হামের কারণে সর্বোচ্চ মৃত্যু বাংলাদেশ দেখেছে ২০১৭ সালেড়৯০ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল সে বছর, সেটা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ত্রিপুরা পল্লিতে। ২০১৬ সালে হামজনিত মৃত্যু ছিল মাত্র একটি। ২০১৮তে ৬টি। আর ২০২৬ সালে কেবল মার্চুএপ্রিল মাসেই হামজনিত শিশুমৃত্যু ছাড়িয়ে গেছে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ১৫ গুণ! এদের অধিকাংশের বয়স দুই বছরের কম। কেন? কী অপরাধ এই শিশুদের? বিল গেটসের ভাষায় বলতে হয়ড়এদের অপরাধ একটাই। তারা জন্মেছে বাংলাদেশে!

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীর ভিড় বাড়ছে। আলীকদম, বান্দরবান, ২৩ এপ্রিল

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীর ভিড় বাড়ছে। আলীকদম, বান্দরবান, ২৩ এপ্রিলছবি: মং হাই সিং মারমা

ইউনিসেফ এর আগে ২০২৪ সালকে শিশুদের জন্য সবচেয়ে খারাপ বছর ঘোষণা দিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। কারণ, সে বছর হাইতি, লেবানন, ইউক্রেন, ফিলিস্তিন, মিয়ানমার, সুদান ও বাংলাদেশে হাজার হাজার শিশু বড়দের রাজনীতি ও বড়দের দ্বারা সৃষ্ট যুদ্ধবিগ্রহের কারণে প্রাণ হারিয়েছিল। হাজার হাজার শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে, গৃহহীন হয়েছে, স্কুল থেকে ঝরে গেছে, অপুষ্টি আর দুর্ভিরে শিকার হয়েছে।

ইউনিসেফের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিশুদের জন্য এত খারাপ সময় পৃথিবীতে আর কখনো আসেনি। কেন? কারণ, বড়রা যখন নানাভাবে নানা সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন, তখন বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়েছে শিশুদের, যাদের এসব সংঘাতে কোনো ভূমিকা ছিল না। বাংলাদেশেও তাই হয়েছিল। চব্বিশের অভ্যুত্থানে ১৪০টি শিশুকিশোরকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। জুলাই ২০২৫এ বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেট এ নিয়ে একটি সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করেড়চিলড্রেন অ্যাজ আ ভিকটিম অব ডেডলি পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স। এই সম্পাদকীয়তে বিশ্বের সব সরকার, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয় যেন সব ধরনের রাজনৈতিক সংঘাত থেকে শিশুদের সুরা দেওয়া হয়, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে এই প্রাদুর্ভাবের আগে বাংলাদেশ হাম নির্মূলের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল। হামপ্রতিরোধী টিকার প্রথম ডোজের কভারেজ ২০০০ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ১১৮ শতাংশ। দ্বিতীয় ডোজ দেশব্যাপী চালুর পর ২০১২ সালে কভারেজ ছিল ২২ শতাংশ।

২০২৪ সালে তা বেড়ে হয় ১২১ শতাংশ। একই সময়ে পরীাগারে নিশ্চিত হাম রোগীর হার দ্রুত কমে এসেছিল। তবে ২০২৪-২৫ সালে দেশে এমআর টিকার জাতীয় পর্যায়ের ঘাটতির কারণে টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ বা এমআর১ ও এমআর২ কভারেজ কমে যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৫ সালে ২৭ বছর ধরে চলে আসা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (এইচএনপিএসপি) অপারেশনাল প্ল্যান বা ওপি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বহুজাতিক ঋণদাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত হতো। ফলে বন্ধ হয়ে যায় স্বাস্থ্য খাতের ৩৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি। এর মধ্যে অন্যতম হলো সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য।

বন্ধ হয়ে গেছে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো। একের পর এক তালা ঝুলেছে কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে। অন্তঃসত্ত্বা নারীরা পাননি জরুরি ফলিক অ্যাসিড ও আয়রন ট্যাবলেট। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ঘাটতি পড়েছে।এভাবেই কলমের এক খোঁচায় মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে যায় আমাদের শিশুদের। শিশুরা তা কখনো জানতেই পারেনি, পারবেও না। হ্যাঁ, এই শিশুদের অপরাধ যে তারা জন্মেছে এই দেশে। যে দেশে বড়দের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর বড়দের পারস্পরিক বিদ্বেষের বলি হয়ে তাদের মরে যেতে হয় দলে দলে। পাঁচ বছরের জন্মদিন পালন করার আগেই ভোরের শিউলি ফুলের মতো ঝরে যায় তারা। আর তাদের চাদরমোড়া লাশ কোলে নিয়ে স্বজনেরা প্রকাশ্য রাজপথে যখন ছোটাছুটি করেন, তখন সেই বড়রা তার কাছেই সংসদে নিজেদের জন্য নতুন গাড়ি নতুন অফিস বাড়ির বায়না ধরে হাসি তামাশায় মেতে ওঠেন। বড়দের রাজনীতিতে শিশুরা এভাবেই বলি হতে থাকে।

বাম রাজনীতি কি উধাও হয়ে গেল

খন্দকার হাসনাত করিম
সিনিয়র সাংবাদিক

বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিলীনপ্রায় বামপন্থীরা। দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও এখন আর কোনো বামপন্থী পাওয়া যাবে না- তা সে চীনপন্থী হোক আর রুশপন্থীই হোক। ভারতের কেরালা, পশ্চিম বাংলা হোক কিংবা খোদ রাশিয়া, চীন, কিউবা, যুগোস্লাভিয়া, চেক বা পোল্যান্ড হোক সমাজতন্ত্রের দুর্গগুলো থেকে মাত্র দেড় শ’ বছরের মধ্যে এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শাসনব্যবস্থা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের লাল ঝাণ্ডা উঠেছিল। এর পর বড় জাগরণ নিয়ে আসে চীনের সমাজতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সোভিয়েত বিপ্লবের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে কিউবা থেকে শ্রীলঙ্কা কিংবা চিলি থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। সেই লাল রঙ ফিকে হতে হতে আজ নিশ্চিহ্ন। সমাজতন্ত্র আসলে একটি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা; তাই প্রকৃতিই তাকে খারিজ করে দিয়েছে। নীতিগতভাবে সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য ও একতা। ছিল সর্বহারা শ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। তবে কার্যত সাম্যের পরিবর্তে একদলীয় শাসনব্যবস্থার সমুদয় কুফল একসাথে হয়ে বাম-স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়। যেখানে মৃত্যু অথবা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া শাসক বদলের কোনো পথই থাকে না। যেমন, এক ঘণ্টার বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় নিকোলাই চসেস্কুর। তার সাথে মরতে হয় তার স্ত্রী ও পরিবারের সব সদস্যকে।

সমাজতন্ত্রের আঁতুড়ঘর খোদ রাশিয়ায় পতন শুরু হয় সমাজতন্ত্রের। আশির দশকে ‘গ্লাসনস্ত’ এবং ‘পেরেস্ত্রয়কা’ নামের সুবিধাবাদী সংস্কারের নামে সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন মিখাইল গরবাচেভ-এর মতো একনায়ক। সোভিয়েত দেশ ছেয়ে যায় কোকাকোলার ব্যানারে। অথচ আমেরিকার সাথে চুটিয়ে বাণিজ্য করা শুরু করলেও কোকাকোলার একটি বোতলও চীনারা গ্রহণ করেনি। তারা উৎপাদন ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বীকৃতি দিলেও শাসন ও নৈতিকতার প্রশ্নে ধরে রাখে সমাজতন্ত্রের আদর্শ।

রাশিয়া যেখানে সংশোধনবাদের পথ ধরে দেশজুড়ে সমাজতন্ত্রের বদলে অতিপরতন্ত্র (অভিগারসি) কায়েম করে, চীনারা সেখানে ব্যক্তি উদ্যোগের সাথে জনকল্যাণের মিশেলে জগৎকে অবাক করে দিয়ে মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ২০তম বড় অর্থনীতিকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করে।

বিশ্বের বামপন্থী মতবাদের শব মিছিলে শরিক বাংলাদেশের অবস্থা সত্যি একটি বৈশ্বিক নজির। অবশ্য বাংলাদেশের বামপন্থীদের নির্মূল হওয়ার সূচনা হয় মস্কো-পিকিং বিরোধ থেকে। আর তাদের গণবিচ্ছিন্নতার মূল কারণ ধর্মের বিরোধিতার সাথে ভারতীয় শঠতা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ দেশের বাম রাজনীতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও আনুগত্য ছিল হিন্দু নেতাকর্মীদের দখলে। তারা বাংলাদেশের মজদুর শ্রেণীর স্বার্থ রার পরিবর্তে ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস বা টাটা-বিড়লা-মফতলাল-বাজাজ-গোয়েংকা পুঁজিবাদের এত বড় বাজার দখলের স্বার্থে মদদ জোগায়। তারা অশান্তি হানাহানির লে্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কৃষকদের ‘সীমান্ত প্রভু’ আখ্যা দিয়ে তাদের গলা কাটা শুরু করে, এটা বেশি ঘটে খুলনা থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত। ‘নকশালবাড়ির লাল আগুনে পূর্ববাংলা জ্বলবে’ এই ছিল তাদের রণধ্বনি। অথচ ইউরোপের মতো এই দেশে তেমন কোনো বড় সামন্তবাদী ভূমি প্রভুর অস্তিত্ব ছিল না। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে একটি বুর্জোয়া দল হয়েও মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫০ সালে এ দেশের জমিদারি প্রথা রদ করে। এ ছাড়া ঋণ সালিশি বোর্ড প্রতিষ্ঠার মতো সংস্কার আইন প্রত্যয়ন করে মুসলিম লীগ সরকার এ দেশের সামন্ত প্রথা একপ্রকার নির্মূল করে। এ সংস্কারের অন্যতম প্রবাদপুরুষ ছিলেন বাংলার কৃষক প্রজাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক।

অতি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বামপন্থীদের রাজনৈতিক রক্তশূন্যতা এবং গণবিচ্ছিন্নতা বৈশ্বিক মার্কসবাদী দর্শনের ভরাডুবির এক রূপক দৃষ্টান্ত। শিল্পাঞ্চলে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং তাদের অনুগত শ্রমিক সংগঠক এবং আন্দোলনকারীদের গণবিচ্ছিন্নতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদিও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ‘জনপ্রিয়তার’ একধরনের মিথ্যা আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বামপন্থীদের শবাধারে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছে।

যেখানে জার্মানি, যুক্তরাজ্য এমনকি খোদ আমেরিকায় পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব আছে, সেখানে এককালের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বামপন্থীরা এবারের নির্বাচনে একেবারে গো-হারা হেরেছেন। এটি লজ্জাজনক হলেও রাজনীতির বাস্তব গণিত।

রামপন্থী এবং ধর্মবিরোধীদের খপ্পরে পড়ে এত করুণভাবে তাদের হারিয়ে যাওয়া এটি আফসোসের। টঙ্গী ও গাজীপুর শিল্প এলাকায় বাম দলের কাঁচি প্রতীকের প্রার্থী সাকুল্যে ভোট পেয়েছেন ২৫০টি। এর চেয়ে লজ্জাজনক পরাজয় আর কী হতে পারে? মোট কথা, পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী-বাকশালীদের দোসর হিসেবে বামদের এহেন বিপর্যয়। পর্যুদস্ত হয়েছে বাম ঐক্যের শেষ প্রয়াস ‘গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট’। অর্থাৎ, বামপন্থীরা এখন রাজনীতির আইসিইউতে।

এরপর হয়তো ঠাঁই হবে মর্গে!

একবার ভেবে দেখুন, এ নির্বাচনে ১০ দলীয় বাম জোটের ১৪৭টি আসনে সারা দেশে ভোট পড়েছে এক লাখ ১৭ হাজারের মতো, যা কিনা প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের ০.১৭ শতাংশ। জোটের বেশির ভাগ প্রার্থীর ভোট সংখ্যা এক হাজারের নিচে। অনেকের ১০০-এরও নিচে। জামানত খুইয়েছেন সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহিল কাফী রতন। এতে কি পরিষ্কার নয় যে, স্বৈরাচারের তোষণ, ভারতপ্রেম, ইসলামবিদ্বেষ, মতাদর্শগত বিভাজন, নেতৃত্বের অহমিকা, মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আদর্শবাদী নীতি থেকে প্রস্থান, গণসম্পৃক্ততা থেকে বিচ্ছিন্নতা, পতিত স্বৈরাচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রভৃতি গণধিকৃত কার্যকলাপের ফলে তারা জনসাধারণের ন্যূনতম সমর্থন থেকে খারিজ হয়ে গেছে?

এই বাম ঐক্যফ্রন্টে কম করেও ১০টি বামপন্থী দল সমবেত হয়। একই সাথে নির্বাচনে অংশ নেয়। ওই যুক্তফ্রন্টে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত দল ছিল চারটি। তারা মোট ৯৭টি আসনে জোটগত প্রার্থী দিয়েছিল। তাদের সবার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের শিবির সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার আগে থেকে পৃথিবীর এ অংশে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর বিভাজনের লণ দেখা দিতে থাকে। এর অনেকগুলো পটভূমিকার মধ্যে অন্যতম হলো পার্টিগুলোর নেতৃত্বে হিন্দু নেতাদের শঠতা এবং পলিটব্যুরোগুলোয় হিন্দুদের অনুপ্রবেশ। পূর্ববাংলার মতো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় তারা চরমপন্থী রূপ ধারণ করে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কৃষক ও ভূমিমালিকদের খুন করা শুরু করে। তারা একে অন্যের চেয়ে বেশি বা বড় মস্কোপন্থী কিংবা পিকিংপন্থী বলে আত্মতুষ্টি পেতে থাকেন। থানা ফাঁড়ি বা চৌকি লুট করে তাদের ‘অস্ত্রাগার’ আরসেনাল বাড়াতে থাকে। মাও সেতুং যে বলেছিলেন, ‘মাছ যেমন পানিতে মিশে থাকে, তেমনি কমিউনিস্টদেরও জনগণের মধ্যে মিশে যেতে হবে’। যে নির্দেশনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তারা দলীয় গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই সাথে নেতৃত্বের কলহ-বিবাদ থেকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দলের নেতৃত্বে ঢুকে পড়ে সরকারি গোয়েন্দারা, যারা ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতে লিপ্ত থাকে।

এ দেশে স্বাধীনতার পর থেকে বামপন্থী দলগুলোর ভাঙন প্রকাশ্য রূপ নেয়। একপ শাসকদল আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে যোগ দেয়; অন্যপ স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি) এম-এল নামে বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে ও মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোয় তৎপরতা চালাতে থাকে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদারতায় গুপ্ত অবস্থা থেকে অনেকগুলো দল প্রকাশ্যে উঠে আসার সুযোগ পায়; কিন্তু ওই যে কথায় বলে, ‘কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না’, ছোট বড় মিলিয়ে ১০টি দল নির্বাচন কমিশনে বিধিবদ্ধ হয়। বাকিগুলো আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে যায় অথবা রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তবে আওয়ামী লীগ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পতিত এবং দেশ ছাড়া হওয়ার পর বামপন্থী দলগুলো আর কোনোভাবে মাজা সোজা করে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাজনৈতিক অপমৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে তাদের অস্তিত্ব আজ বিলীন হওয়ার পথে। অস্তিত্ব বলতে যা অবশিষ্ট আছে তা হলো বাম বুদ্ধিজীবীদের সভা-সমাবেশ এবং পল্টন-সর্বস্ব মাইকের প্রচারণা, যেখানে বক্তাও তারা, শ্রোতাও তারা।

৭৮ বছর ধরে মস্কো ও দিল্লির ধামা ধরে তারা পেল ২০২৬-এর নির্বাচনে ০.০৮ শতাংশ ভোট। শূন্য আসন! অর্থাৎ রাজনীতির আইসিইউর মধ্যেও নয়, তাদের ঠাঁই হলো ‘মরচুয়ারি’ বা মর্গে।

লেজুড়বৃত্তির এ উদাহরণ রাজনীতিতে একটি বিস্ময়কর পর্যবেণের খোরাক হয়ে থাকবে। বাম দলগুলোর মধ্যে ধর্মবিরোধিতার প্রভাব তাদের এ করুণ জীবনাবসানের জন্যও এক মস্তবড় শিণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

ধর্মের বিরোধিতা যে এ দেশের মানুষ কখনো মেনে নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও যে মেনে নেবে না, বামদলগুলোর সমাধিগাত্রে সত্যটি শিলালিপি আকারে খোদাই হয়ে থাকবে।